একুশ কি আরেকটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাতে পারবে?

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

প্রাচীনকালের উপকথার বীর স্যামসনের গোপন শক্তির উৎস ছিল তার চুলের গুচ্ছ। ওই শক্তিতে সে অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল। স্যামসনের এই সিক্রেট জানতে পেরে শত্রুপক্ষ তার প্রেমিকা ডেলায়লাকে ভুল বুঝিয়ে ওই চুলের গুচ্ছ নিদ্রিত স্যামসনের মাথা থেকে হরণ করেছিল। ফলে এই মহাবীরকে বন্দি করা তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। স্যামসন এই চুলের গুচ্ছ উদ্ধার করার পরই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আবার দাঁড়াতে পেরেছিল।

বাঙালি জাতিরও গোপন শক্তির একটা উৎস আছে। সেটি তার লোকজ ভাষা-সংস্কৃতি। বাঙালির এই ভাষা-সংস্কৃতি অপহরণ করার জন্য হাজার বছর ধরেই নানা চক্রান্ত হয়েছে। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বে বাংলাকে 'রৌরব নরকের ভাষা' আখ্যা দিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে। বাংলা ভাষায় বেদবেদান্ত চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে যুগের বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বাংলা ভাষাকে রক্ষার জন্য তার আদি নিদর্শন চর্যাগীতিকাগুলো বুকের মধ্যে লুকিয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

ইংরেজ আমলের সূচনাতেও বাংলা ভাষার ওপর শুদ্ধিকরণের খড়্গ নেমে এসেছে। এই হামলা চালিয়েছিলেন নব্যশিক্ষিত একশ্রেণীর হিন্দু পণ্ডিতই। বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকভাবে এসে যাওয়া আরবি-ফার্সি শব্দ, রূপক, উপমাগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করে

তারা চেয়েছিলেন বাংলাকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেলতে। সেই সংস্কৃতবহুল কৃত্রিম বাবু ভাষায় লেখা উপন্যাস নাটকে দন্তস্ফুট করার ক্ষমতা ছিল না সাধারণ মানুষের। তাদের বোধগম্য ভাষার সঙ্গে বইয়ের ভাষার একটা দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছিল।

এই ব্যবধান ঘুচিয়ে বাংলাকে আবার সহজ ও গণমুখী করার আন্দোলনও শুরু হয়েছিল সে যুগেই। যারা বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাদের নাম দেয়া হয়েছিল 'শব পোড়া মণ্ডাদহের' দল। সংস্কৃতবহুল এই বাবু ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সফল হয়েছিল। তারপর এই আন্দোলন আরও একধাপ এগিয়ে সাহিত্যে সাধু ভাষার পাশাপাশি কথ্য ভাষাকে স্থান দেয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথও এ সম্পর্কে প্রথমদিকে দ্বিধান্বিত ছিলেন। পরে নিজেই এই প্রচেষ্টায় সম্মতি ও সমর্থন দেন।

অবিভক্ত বাংলায় বাংলা ভাষাকে আরও গণসম্পৃক্ত শক্তিশালী ভাষায় পরিণত হতে সাহায্য করে গণসাহিত্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট বা বামঘেঁষা বুদ্ধিজীবীরা। সংস্কৃতবহুল বাবু ভাষার অনুসারীরা জনজবানের যেসব আরবি-ফার্সি শব্দ ভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিলেন, তারা আবার সেগুলো ফিরিয়ে আনেন, এমনকি কোন কোন শব্দের বা কথার অর্থকে সম্প্রসারিত করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফতোয়া ও শহীদ শব্দ দুটির কথা। এই দুটি শব্দের প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী ধর্মীয় বিধান জারিকে বলা হতো ফতোয়া এবং ধর্মযুদ্ধে যারা মারা যেতেন, কেবল তাদেরই বলা হতো শহীদ।

তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার বাম বুদ্ধিজীবীরা আরও অনেক শব্দের সঙ্গে এই দুটি কথার অর্থও সম্প্রসারিত করে তাকে গণআন্দোলনের ভাষা করে তোলেন। এতকাল কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বইটির বাংলা অনুবাদ করা হতো কমিউনিস্টদের ঘোষণা বা প্রচারপত্র নামে। কিন্তু অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা বাংলায় তরজমা করা কমিউনিস্ট মেনিফোস্টোর নাম দেন 'সাম্যবাদী ফতোয়া'। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যেসব স্বাধীনতা কর্মী বা বীর আত্মদান করেছেন, তাদের নামের আগে শহীদ বসানো শুরু হয়। যেমন শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ প্রফুলস্ন চাকি, শহীদ রামেশ্বর ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার রূপান্তর এবং তার গণভাষা হয়ে ওঠার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ ব্যাপারে ব্রিটিশ আমলের খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা প্রাচীন যুগের হিন্দু আমল এবং ব্রিটিশ যুগ-পরবর্তী পাকিস্তান আমলের মতো শাসননীতির অঙ্গ হিসেবে বাংলা ভাষাকে নিপাতনের নীতি গ্রহণ না করে সেই ভাষার পুষ্টিসাধন দ্বারা তার সাহায্যে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের

দ্বারাই বাংলায় মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, বইপত্র (ধর্মীয়) প্রকাশ এবং বাংলা ভাষার প্রসার শুরু হয়।

ব্রিটিশ আমলে শাসক শক্তির সহায়তায় ও আনুকূল্যে খ্রিস্টান মিশনারিরা যে ভাষানীতি অনুসরণ করেছেন, পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানি শাসকরা অনুসরণ করেছেন তার সম্পূর্ণ উল্টোনীতি। তাদের অনুসৃত নীতি ছিল সম্পূর্ণ গণবিরোধী এবং সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক উপনিবেশবাদ। স্যামসনের চুলের গুচ্ছের মতো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা হরণ অথবা ধ্বংস করে একটি পরাক্রম ও পরিচয়হীন দাস জাতিতে তাদের পরিণত করতে চেয়েছিলেন।
ব্রিটিশ আমলের সূচনায় একশ্রেণীর হিন্দু পণ্ডিত ও ভাষাবিদ চেয়েছিলেন বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের বশ্য প্রজায় পরিণত করতে। চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় ও সাধারণ বাঙালি মুলমানের জবানে স্বাভাবিকভাবে ঢুকে পড়া আলস্নাহ, খোদা, রাসূল, রোজা, নামাজ ইত্যাদি কথাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে। তেমনি পাকিস্তান আমলের অবাঙালি মুসলমান শাসক শক্তি তাদের ক্রীতদাস একদল বাঙালি মুসলমান লেখক ও সাহিত্যিকের সহায়তায় বাংলা ভাষাকে খতনা করে চেয়েছিলেন মুসলমানি ভাষা বানাতে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঈশ্বর, ভগবান, জল, অঞ্জলি, অর্ঘ্য ইত্যাদি ধরনের কথা ব্যবহার কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৫১ সালে কবি শামসুর রাহমান তার বিখ্যাত ‘রূপালি স্নান’ কবিতায় ‘ঈশ্বর’ কথাটি ব্যবহার করায় একটি দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক সেটি ছাপতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এমনকি পাকিস্তান আমলের শেষদিকেও আইয়ুবের আত্মজীবনী ফ্রেন্ডস, ‘নট মাস্টার্স’ বইয়ের বাংলা অনুবাদের শিরোনাম প্রভু নয়, ‘বন্ধু’ দেয়া হলে প্রবল আপত্তি উঠেছিল। তৎকালীন তমদ্দুনি সাহিত্যিক গোষ্ঠী বইটির বাংলা নাম করেছিলেন ‘মনিব নয়, দোস্ত’।

পাকিস্তানি আমলে বাঙালি জাতিকে বশ্য প্রজায় পরিণত করার চেষ্টা, তার লোকজ ভাষা-সংস্কৃতিকে হিঁদুয়ানি ভাষা-সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে তাকে বিনাশের চেষ্টা, বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তন ও বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্র, শরৎ-সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার বর্জন, যাত্রা, জারি, সারি, নবান্ন উৎসব এমনকি বাংলা নববর্ষ উৎসবকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিকে তার প্রাণপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত চলেছে অবিরামভাবে।

স্যামসন তার অপহৃত চুলের গুচ্ছ উদ্ধার করে আবার গোপন শক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। বাঙালি জাতিও তার ভাষা আন্দোলন এবং সেই আন্দোলন থেকে উদ্ভূত বায়ান্নর রক্তাক্ত একুশে থেকে তার হারানো পরিচয়, পরাক্রম ও সংস্কৃতিবোধ ফিরে পায়। ফলে

তার সঠিক স্বাজাত্যবোধে ফিরে যাওয়ার সংগ্রাম দুর্বার হয়ে ওঠে, যার পরিণতি একাত্তরের স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং বাংলাদেশ নামে সেক্যুলার নেশন স্টেটের প্রতিষ্ঠা।

পাকিস্তানের ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির রাষ্ট্রনীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার কবল থেকে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেও সেই মুক্তি স্থায়ী হতে পারেনি। পরাজিত সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা এবার সম্মিলিত হয়ে উগ্র মৌলবাদী দানবের চেহারা নিয়ে বাঙালির সেক্যুলার জাতীয় অস্তিত্বকে ক্রমশ গ্রাস করতে চাইছে এবং তার ভাষা ও সংস্কৃতিকেও বিনাশ করতে চাইছে। আর ঠিক এই অবস্থার পটভূমিতে গত চার বছর ধরে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদ দিবস। এই দিবসটি পালনের মধ্যে আগের সেই প্রাণোন্মাদনা আর নেই। তাকে ক্রমাগত তার শক্তির আসল উৎস লোকজ সংস্কৃতির শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্তমান শাসক জোটের বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সেই ১৯৫২ সাল থেকে যারা একুশের শত্রু এবং একুশের শহীদ মিনারটিকে পর্যন্ত যারা বারবার ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, তারা অথবা তাদের অনুসারীরা আজ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে এবং স্যামসনের মতো একুশকে শক্তিহীন করে তাদের কব্জায় রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরা শুধু একুশের নয়; একুশে সম্পৃক্ত বাঙালি জাতীয়তার সমস্ত ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের বিনাশ ঘটাতে চায়।

এরা জাতীয় সঙ্গীত বদলাতে চায়। এখন পর্যন্ত তা না পেরে কয়েকবার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় যান্ত্রিক গোলযোগের অজুহাতে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

এরা একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে উত্তোলিত জাতীয় পতাকা বদল করে চাঁদতারা খচিত জাতীয় পতাকা ওড়াতে চায়। বর্তমান জোট সরকারের শরিক জামায়াতের ছাত্র সংগঠন এই উদ্দেশ্যে অঘোষিতভাবে চাঁদতারা খচিত পতাকা নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে মিছিল করেছে।
এরা জাতির পিতার নাম ও স্মৃতি মুছে ফেলতে চায়।

এরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা তৈরি বাংলাদেশের সেক্যুলার সংবিধানকে কলমের আঁচড়ে বদল করে একটি সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় চরিত্র দান করেছে।

এরা বাঙালির লোকজ উৎসবগুলোকে পাকিস্তানি শাসকদের কায়দায় বাতিল করতে চায়। বহুক্ষেত্রে বোমাবাজি ও ধর্মীয় ফতোয়াবাজি দ্বারা এই উৎসব ভণ্ডুল ও বন্ধ করেছে।

পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচলিত একুশের গানের ওপরও তারা আঘাত হানতে চায়। মন্ত্রী নাজমুল হুদা ঘোষণা করেছেন, একুশকে আটই ফাল্গুন নাম দিয়ে তারা নতুন গান রচনা করবেন।

চুয়ান্ন বছর আগে একুশের প্রথম শহীদ মিনার কয়েক দফা ভেঙেছিল পাকিস্তানি শাসকরা। তাতে সায় ও সমর্থন ছিল মুসলিম লীগ দলের। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদাররা যখন কামান দেগে একুশের শহীদ মিনার ভেঙে দেয়, তখন তাতে সহায়তা জুগিয়েছিল বাংলাদেশের জামায়াতিরা। তারা ছুটে গিয়ে শহীদ মিনারকে মসজিদ ঘোষণা করে সেখানে আজান দিয়ে শুক্রবারের জুমার নামাজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। ঢাকায় কোন মুসলমান সেই নামাজে অংশগ্রহণ করতে যায়নি। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে সেই পরাজিত মুসলিম লীগের উত্তরসূরি বিএনপি এবং একই মওদুদী জামায়াতের পতাকাবাহী গোলাম আযম এবং নিজামীর জামায়াত জোটবদ্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন। একুশে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি, সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তার প্রতি তাদের একই রাগ, একই আক্রোশ। এই জাতীয়তার স্বাধীন অস্তিত্বকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা যে কাজটি সমাপ্ত করে যেতে পারেনি, সেই কাজটি এরা সমাপ্ত করতে চায়।

একুশের শহীদ মিনারটি এখনও আছে। তার বয়স চুয়ান্ন বছর। তাকে সহজে ভেঙে ফেলা এখন আর সম্ভব নয়। তাই শাসকদের চেষ্টা তাকে প্রাণহীন করার এবং প্রাণহীন করে রাখার। তাই তারা করতে চাইছেন। দেশের প্রকৃত সাংস্কৃতিক সংস্থগুলো যাতে এই শহীদ মিনার সহজে ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করা হয়। লজ্জাকরভাবে ফ্যাসিস্ট কায়দায় এই শহীদ মিনার একবার পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাকে এখন নানাভাবে অবহেলা দেখানো হচ্ছে। জাতীয় সঙ্গীতের ব্যবহার নানা কৌশলে বিঘ্নিত করা হচ্ছে। জাতীয় চেতনার মূল অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিগুলোকে ক্রমশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। দেশের মাইনরিটি কমিউনিটি ও কালচারকে ধ্বংস করে দেশটিকে তালেবানি রাষ্ট্র করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। নারী সম্প্রদায়কে কোথাও ফতোয়া, কোথাও হুমকি দ্বারা বোরখাবন্দি, হিজাববন্দি করে রাখার চেষ্টা চলছে। একদিকে বহির্বিশ্বের চাপে মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে;

অন্যদিকে তথাকথিত ইসলামী এনজিওগুলোর মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে মৌলবাদের শক্ত অর্থনৈতিক শিকড় ছড়ানো হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন, কেবল রাজনৈতিকভাবে বা শুধু অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের রাজনৈতিক দল দ্বারা কি এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ও শত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব একুশের ইতিহাস খুঁজলেই পাওয়া যাবে। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানি শাসকদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি দরকার হয়েছিল একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিকে মুখ ফেরাতে হয়েছিল তার নিজস্ব ভাষা ও লোকজ সংস্কৃতির দিকে। রাজনৈতিক সংগ্রামকে ভাষা আন্দোলনের বর্ম ধারণ করতে হয়েছিল। এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম থেকেই গড়ে উঠেছে একুশের ভাষা শহীদ মিনার। যার শিকড় রয়েছে বাঙালির হাজার বছরের লোকজ ভাষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মধ্যে।

আজ এই ঐতিহ্য বিচ্ছিন্নতার জন্য একুশে শক্তিহীন এবং একুশের মিনার প্রাণহীন। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের গণমুক্তির রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি অবশ্যই একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে জরুরি দরকার একটি কালচারাল রেভলু্যশন গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে বায়ান্ন সালের মতো আমাদের সুশীল সমাজকে, সংস্কৃতিসেবী সমাজকে সব সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতার কুয়াশার ঘোর কাটিয়ে লোকজ ভাষা-সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। একুশের পাথুরে মিনারে তার প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করতে হবে। দেশের রাজনীতিকেও সেই গণসংস্কৃতির প্রভাব বলয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। বাংলার আবহমানকালের সেক্যুলার সংস্কৃতির লৌকিক শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে বাংলাদেশে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাজনীতিও শক্তিশালী হবে না; বাংলাদেশের স্বাধীন, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা যাবে না।

একুশের কালচারাল রেভলু্যশন পরবর্তীকালের পলিটিক্যাল রেভলু্যশনকে গড়ে তুলেছে এবং তার রাষ্ট্র ভাবনাকে সফল করেছে। আজ যদি বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক অনুরূপ একটি সাংস্কৃতিক বিপস্নব না হয়, তাহলে শত ২৩ দফা ঘোষণা করেও বাঙালির গণমুক্তির নবপর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করা যাবে না। এখন তাই সরকার উচ্ছেদের স্স্লোগানের চেয়েও আরেকটি একুশের আন্দোলনের শক্তিশালী স্স্লোগান ওঠা উচিত। সেক্যুলারিজম ও সেক্যুলার রাজনৈতিক কালচারের পক্ষে আওয়ামী লীগসহ গণতান্ত্রিক দলগুলোর সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করা প্রয়োজন। মৌলবাদ ও ফ্যাসিবাদের সমন্বয়ে যে ভয়াবহ শত্রু শিবির আজ গড়ে উঠেছে; আরেকটি

একুশ এবং সেই একুশভিত্তিক সংগ্রাম ছাড়া তাকে মোকাবেলা করার দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই।

স্যামসনের চুলের গুচ্ছ ফিরিয়ে দেয়ার মতো একুশকে তার সেক্যুলার সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে আবার যুক্ত করতে হবে। তাহলে একুশ তার শক্তি আবার ফিরে পাবে। বয়স চুয়ান্ন হলে কি হবে? শক্তির উৎসে ফিরে গেলেই সে আরেকটি কালচারাল রেভল্যুশনের প্রতীক হয়ে উঠবে।